গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থাগার

ফজলে রাব্বি

গ্রন্থ নিয়েই গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থই শিক্ষার প্রধান উপকরণ। তাই গণগ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে যায়। শিক্ষাব্যবস্থা ও গণগ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। কেবল তাই নয়– গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। উল্লেখ অবান্তর, বাংলাদেশে এই তিনটির কোনোটিই যথাযথ নেই। অথচ স্বাধীন রাষ্ট্র যে-ক্ষমতা তার শাসকদের দিয়েছিল তা দিয়ে এই তিনটির অন্তত যেকোনো একটিকে সফল করলেই বাকি দুটো আপন ইচ্ছেয় আলোর মুখ দেখতে পেত। জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্তসমস্ত থাকা সময়ে সার্বজনীন হিতকর কাজ করার সদিচ্ছা খুব একটা দেখা যায় না।

শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের দুটি পদ্ধতি বা ধারা দীর্ঘকাল যাবত প্রায় সকল দেশেই চলে আসছে। এই পদ্ধতি বা ধারার একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটি অপ্রাতিষ্ঠানিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয় পরিবার থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বেশি কিছু না শিখলেও আশা করা যায় সে তার মাতৃভাষা ভালোভাবে লিখতে ও পড়তে শিখবে, সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে শিখবে। তাই বিশ্বের সকল স্বাধীন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। ফলে সাক্ষরতা সেসব দেশে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে শতভাগ সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। যারা শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে আর অগ্রসর হতে পারে না, তখন তারা অগ্রসর হয় গ্রন্থাগারের সহায়তায়। তাই গণগ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য– স্বাধীন দেশে যে-সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন আজও আমাদের দেশে ঘটে নি। শিক্ষার সুযোগ ও অধিকার সকলের জন্য সমান হয় নি। শিক্ষা কেন সর্বজনীন হয় নি সেই কারণও আমরা যথাযথ নির্ণয় করতে পারি নি। বরং শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ, নাকি ধর্মযুক্ত অথবা শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে, না অন্য ভাষায় হবে সেটি নিয়েই আমরা তর্ক করে কালক্ষেপণ করেছি। শিক্ষা কেন সর্বজনীন হয়নি সেই কারণ নির্ণয় করতে পারলে হয়তো আমাদের অনেক সমস্যার কারণও নির্ণয় করতে পারতাম। এবং তার সমাধানও খুঁজে পেতাম।

তবে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে একটু পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমরা অনেকেই জানি না ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে এদেশে একপ্রকার সর্বজনীন শিক্ষার প্রচলন ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানি আমলে ইংরেজরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দেশে যে-সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামো বিদ্যমান ছিল সেই অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিল। একইভাবে তারা আমাদের এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ করেছিল, যাতে এই নতুন আর্থসামাজিক অবকাঠামো ইংরেজদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

তারই ফসল আজকের কথিত পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা, যে-শিক্ষাব্যবস্থা দেশের আপামর মানুষের জন্য নয়, যে-শিক্ষাব্যবস্থা শাসকবর্গের তথা সরকারের অনুদান আর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, যে-শিক্ষাব্যবস্থা একটি শ্রেণীকে অভিজাত ভাবতে শেখায় আর অপর শ্রেণীকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবতে শেখায়, যে-শিক্ষাব্যবস্থা একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীকে সিভিল সোসাইটি ভাবতে শেখায় এবং যে-শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব অবস্থায় শুধুই চাকরিমুখী। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর অংশ সামাজিকভাবে উদ্যমহীন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা যখন তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে–সেই ব্যবস্থা ছিল মুষ্টিমেয়

কয়েকজনের জন্য এবং তা করেছিল এদেশের বিদ্যমান সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বিলুপ্ত করার পর।

অথচ ইংরেজরা নিজেদের দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেছিল এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে; করেছিল সর্বজনীন গণগ্রন্থাগার। এই গণগ্রন্থাগারের কাজ ছিল প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত যারা শিক্ষালাভ করে আর অগ্রসর হতে পারত না, অর্থাৎ যারা আজকের ভাষায় ড্রপআউট, তাদেরকে অধিকতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা। সেজন্য ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গণগ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইন প্রণয়নের পেছনে দুজন সংসদ সদস্য ও একজন গ্রন্থাগারিকের অবদান রয়েছে। সেই গ্রন্থাগারিকের নাম এডওয়ার্ড এডওয়ার্ডস। এই গ্রন্থাগারিক তাঁর প্রথমজীবনে ছিলেন সাধারণ একজন রাজমিস্ত্রি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর আর পড়াশোনা করতে পারেন নি। রাজমিস্ত্রির কাজ শিখে রাজমিস্ত্রি হয়েছিলেন।

তবে কাজের শেষে প্রতিদিন একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়তেন। এমনি করে গ্রন্থাগারের বই পড়ে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত হন এবং আপন প্রতিভায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির সহকারি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করেন যে, গণগ্রন্থাগারের প্রয়োজন কী। তিনি গণগ্রন্থগারের জন্য জনমত সৃষ্টি করেন। গ্রন্থাগার আইন পাশ করান। আইনে বলা হয়, প্রতিটি কাউন্টিতে স্থানীয় সরকার স্থানীয়ভাবে কর সংগ্রহ করে গণগ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা করবেন। সেখানে স্থানীয় সরকার যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, তেমনই গণগ্রন্থাগার পরিচালনা করবেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনো অর্থ দেবে না, অর্থাৎ গণগ্রন্থাগারকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে না। সেই আইনই প্রকৃতপক্ষে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন। সেই আইনবলে সে-দেশে গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

অপরপক্ষে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে বিলেতে সর্বত্র গণগ্রন্থাগার স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়ার কারণে পাঠক যেকোনো বই ক্রয় না করে গণগ্রন্থাগার থেকে ধার করে পড়তে পারেন। বইটি কেনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এর ফলে যখন লেখক মনে করলেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তখন আরেকটি আইন করা হলো, গণগ্রন্থাগারে কোনো একটি বই যতবার পঠিত হবে সেই বইয়ের লেখক ততবার একটি নির্ধারিত হারে রয়্যালটি লাভ করবেন। সেই রয়্যালটি করলব্ধ অর্থ হতে পরিশোধ করা হবে। এই আইনের নাম 'পাবলিক লেন্ডিং রাইট'। এটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে পাশ হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে এই আইন প্রণীত হয়েছে। নিজের দেশের পাঠকের জন্য আইন, লেখকের জন্য আইন, দেশের মানুষের উন্নতির জন্য কত আইন তারা প্রণয়ন করেছে! কিন্তু গ্রন্থাগার-আইন প্রণীত হলো না ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের জন্য।

গণগ্রন্থাগার আইন এমন এক আইন যা প্রণয়ন করতে বা প্রয়োগ করতে কোনো অর্থের

প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষের জন্য এই আইন প্রণীত হলে ইংরেজ সরকারের বা ভারত সরকারের কোনো অর্থের প্রয়োজন হতো না। তবুও তারা ভারতবর্ষের জন্য এই আইন প্রণয়ন করে নি। পরাধীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার-আইন প্রণীত হয় নি। যদিও তার প্রভাবে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ হলো বেসরকারি গণগ্রন্থাগার। এসব গণগ্রন্থাগারই এদেশের প্রাচীন গণগ্রন্থাগার, যেমন– রংপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, যশোর ইনস্টিটিউট সাধারণ গণগ্রন্থাগার, বরিশাল গণগ্রন্থাগার ইত্যাদি পুরাতন মহকুমা ও জেলাশহরে অবস্থিত বেশ কিছু গণগ্রন্থাগার।

তবে ইংল্যান্ডের পাবলিক লাইব্রেরি এবং বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং আজও আছে। ইংল্যান্ডের গণগ্রন্থাগারগুলো ছিল প্রকৃতই জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। আর বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের একটি ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা, অভিজাত শ্রেণীর জন্য। এ অবস্থা গ্রেটব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আইন পাশের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। সেখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে চাঁদা দিয়ে কিছু গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা করতেন। আমাদের দেশে সেভাবেই কিছু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি নিজেদের প্রয়োজনে এসব গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে আমাদের দেশে জমিদারশ্রেণী নেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছেন।

ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ গণগ্রন্থাগার স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির দানে ও সহায়তায় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়েছে। ইংরেজ সরকার তাদেরকে কোনো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি গণগ্রন্থাগারকে সহায়তা অনুদান দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু এর কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। একই ধারায় বাংলাদেশে আজ অবধি নতুন নতুন নীতির ভিত্তিতে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বারবার অনুদান নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে পারে নি। একইভাবে এই বেসরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ সমস্যার।

অন্যদিকে আমাদের গণগ্রন্থাগারগুলো সাধারণভাবে ড্রপ-আউটদের জন্য লক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষিতজনের উচ্চতর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। অথবা বলা চলে–শিক্ষিতজনের বিনোদনের জন্য। ফলে সাধারণ মানুষ এই গণগ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে নি। তারা একটি মসজিদ বা বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু গণগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে না। ফলে গণগ্রন্থাগারের পক্ষে তেমন কোনো সামাজিক সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আমরা যারা বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংগঠক তারা এই সত্য বুঝতে না পেরে পাঠকের ওপর দোষারোপ করি এবং বলি 'পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে'।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত জনগণকে গণগ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ক্রমাগত উচ্চ হতে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারতাম। কিন্তু আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। গ্রন্থাগাওে তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারি না। এ কারণে আজ গণগ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকের স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। এটাই বাস্তব অবস্থা।

ইংল্যান্ডে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। সেখানে কোনো গ্রন্থনীতি প্রণীত হয়েছে বলে জানি না। নিছক আইন প্রণয়ন করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। সেই গণগ্রন্থাগার-ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের আদর্শ গণগ্রন্থাগার সিস্টেম বা ব্যবস্থা। সে-দেশেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিয়ে অধ্যয়নের বিষয় গড়ে উঠেছিল, তাকে বলা হতো গ্রন্থাগারবিজ্ঞান। বর্তমানকালে তাকে বলা হয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান। আমাদের দেশে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ জে. এস. পার্কার দেশের গণগ্রন্থাগার-ব্যবস্থা জরিপ করেন, সেই প্রেক্ষিতে তিনি গ্রন্থাগার আইন পাশ করার প্রস্তাব করেছিলেন। এমনকি আইনের একটি খসড়াও তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি আজ অবধি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা হয় নি। এর কারণ আমরা জানি না।

ভারতেও এটি একটি সমস্যা ছিল, গ্রন্থাগার বিষয়টি ছিল প্রাদেশিক। আইন পাশ করবে প্রাদেশিক সরকার। যেখানে শিক্ষার হার বেশি সেখানে আগে এই আইন পাশ হয়েছে। যেমন তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আইন পাশ করে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত ও বলবৎ হয়েছে। তারপর প্রতিটি জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রকার গণগ্রন্থাগার রয়েছে। যেমন সরকারি, আধা-সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি গণগ্রন্থাগার। তার সংখ্যা ২,৮০০ এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ২,২০০। মোট প্রায় ৫,০০০ ছোটো-বড় গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে সেখানে। তামিলনাড়ুর এত পরে সেখানে কেন গ্রন্থাগার আইন পাশ হলো? কারণ সম্ভবত শিক্ষার হার তামিলনাড়ুতে অনেক বেশি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সমস্যা অনেক ও বিভিন্ন প্রকারের। কোনো একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে তার সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। এসব সমস্যা সম্মিলিতভাবে সমাধান করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের সকল বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের একটি শক্তিশালী সংগঠন, যে-সংগঠন সকলের পক্ষ থেকে, সকলের পক্ষ হয়ে সরকারের সঙ্গে, অন্য পেশাদার সংগঠনের সঙ্গে এবং সহায়তাদানকারী সংস্থার সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা মিলিত হতে পারি নি। যারা দেশের অসংখ্য বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা করেন তাদের সম্মিলিত কোনো সংগঠন নেই। অর্থাৎ মূলত গ্রন্থাগার-সংগঠক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সম্পর্ক নেই।

গণগ্রন্থাগারকে সেবা দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। উন্নত দেশে বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণ করতে হয় নি। তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণগ্রন্থাগারকে যুগোপযোগী করে নিয়েছে। সেখানে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপামর জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আমাদেরকে একটি জিনিস বুঝতে হবে যে আধুনিক মিডিয়া, টিভি, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের যুগে পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা পাল্টে গিয়েছে। এককালে গ্রন্থাগার প্রধানত বিনোদন ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল। গণগ্রন্থাগারে বিনোদনটাই ছিল প্রধান, কারণ তখন শিক্ষিতজনের বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল গ্রন্থপাঠ তথা উপন্যাস-পাঠ, কাহিনি ও গল্পপাঠ। একালে সে-গল্প বা কাহিনি আর কষ্ট করে কেউ পাঠ করতে চায় না। অল্প সময়ে বিনা পরিশ্রমে টেলিভিশনে ও সিনেমায় সে সেই কাহিনি দেখে নিতে পারে।

সে-কারণে এখন গণগ্রন্থাগারে বিনোদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে যারা গণগ্রন্থাগার হতে সেই বিনোদন লাভ করতে চান তাদের আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ গণগ্রন্থাগারে সৃষ্টি করতে হবে। গল্প-উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে যে-বিনোদন সেই বিনোদনের প্রয়োজন কম বলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। তার পরিবর্তে সেখানে যুক্ত হয়েছে তথ্যসেবা। আমাদের গণগ্রন্থাগারে তথ্যসেবার অভাব। অথচ তথ্যের চাহিদা রয়েছে প্রচুর, তাই দেখা যায় সকল গণগ্রন্থাগারে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাই অধিক। বইয়ের পাঠকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যম কেবল সংবাদপত্র নয়, বর্তমানকালে এর বড় মাধ্যম ইন্টারনেট। আমাদের দেশেও ইন্টারনেট দ্রুত বিস্তারলাভ করছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি গণগ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু তাদের অধিকাংশের সেই ক্ষমতা নেই। একদিকে গণগ্রন্থাগারকে সহজে ও সুলভে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে, তেমনই ইন্টারনেট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে যার প্রয়োজন তাকে সরবরাহ করতে হবে।

অল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার কেন্দ্র হিসেবে গণগ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে। সে-কাজ করতে পারেন গ্রন্থাগারকর্মী বা গ্রন্থাগারিক। তাকে তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ করে রাখতে হবে। নিছক চাকরি করে এ কাজ করা যাবে না, সমাজ ও জনমানুষের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক তাগিদ অনুভব করতে হবে। গণগ্রন্থাগারকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

শৈশব হতে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার কথা থাকলেও তা না হয়ে তারা বরং পাঠবিমুখ হচ্ছে। এই প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে যেমন করে উন্নত দেশের গণগ্রন্থাগারগুলো করেছে। সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বিদ্যালয় ও গণগ্রন্থগার একে অপরের পরিপূরক।